মধুসূদনের নাটক   নিজস্ব বিবেচনা

সৌমিত্র বসু

ঘটনাটা সকলেরই জানা। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয় করা হবে শ্রীহর্য রচিত রত্নাবলী নাটক, রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদে। সে নাটকের ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সদ্য মাদ্রাজ ফেরৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। মধুসুদনের পছন্দ হল না রত্নাবলী, বন্ধু গৌরদাসকে তিনি অক্ষেপ করে বললেন, রাজারা এত বাজে নাটকের পেছনে এত টাকা খরচ করছেন এটা বেশ পরিতাপের বিষয়, আগে জানলে তিনি নিজেই এর চেয়ে ভাল একটা নাটক লিখে দিতেন। এই নিয়ে গৌরদাসের ঠাট্টা, এবং মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা। সেই তাঁর বাংলা নাটক লেখার সু, যে ঘটনা বাংলা সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য তৈরি করেছে।

রত্নাবলী সম্পর্কে মধুসূদনের আপত্তিটা ছিল কোথায় ? স্পষ্ট করে জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি। মনে রাখতে হবে রামনারায়ণের রচনা কিন্তু নাটকটির হুবহু অনুবাদ নয়, য়েমন কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার স্বভাবোৎফুল্ল কুসুমনিচয়, অতি যত্নেও এতেদ্দেশের নিম্নভূমিতে বিকশিত হয় না, তদ্রূপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্ররঞ্জক ভাবাদি আধুনিক সংকীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিরক্ষিত হওয়া সুদুরপরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূলগ্রন্থের স্থুল মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করা হইল, এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশে পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে।১

রামানারায়ণের প্রবণতা এর থেকে স্পষ্ট। মূল সংস্কৃত নাটকটিকে বঙ্গভাষার মাপে সাজিয়ে নিচ্ছেন, তার জন্য মূল গ্রন্থের স্থুল মর্ম্মমাত্র গ্রহণ করার স্বাধীনতা নিচ্ছেন তিনি। অর্থাৎ এ নাটক শ্রীহর্ষের হুবহু অনুবাদের চেষ্টা নয়। আমরা জানি, যাকে বলা যায় স্বাধীন অনুবাদ, তার মধ্যে লেখক প্রায়শই তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ঢুকিয়ে দেন, অনুবাদ তখন হয়ে ওঠে অনুবাদকের আত্মপ্রকাশেরই একটা উপায়।

রত্নাবলীর ক্ষেত্রে, এই আত্মপ্রকাশের ধরনটা কি ? মূল নাটকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে তাঁর গ্রহণ বর্জন বা সংলাপ বিন্যাস সর্বতোভাবে তখনকার বাংলা থিয়েটারের মঞ্চযোগ্যতার কথা ভেবে করা। মূল পাঠটিকেসময়োপযোগী কোন ভিন্ন মাত্রা দেবার চেষ্টা সেখানে নেই। যিনি কুলীনকুলসর্বস্ব, নবনাটক লেখেন, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি বা লাম্পট্য নিয়ে লেখেন যেমন অবৈধ প্রেমের সম্পর্ককে সেই একই চোখে বিচার করেন না, তার থেকে অনুবাদ নাটকগুলি বিষয়ে তঁার দৃষ্টিভঙ্গির একটা মাপ পাওয়া যায়।

রামনারায়ণ এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাতেই সংলাপ লিখতে চেয়েছেন। রত্নাবলী অভিনীত হবার পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থে কলকাতায় এক বহিরাগত প্রশ্ন করছেন, “ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া থাকেন....” তখনই সংস্কৃতায়িত বাংলার পাশাপাশি আরবি ফার্সি ইংরেজি মেশানো এক কথ্য ভাষা চালু ছিল। ১৮৫৪ সালে মাসিক পত্রিকার পাতায় বেরতে শু করেছে আলালের ঘরের দুলাল, বই হিসেবে প্রকাশিত হবে ১৮৫৮ সালে। এই ভাষাভঙ্গি নিয়ে অস্বস্তিও তৈরি হচ্ছে, রামগতি ন্যায়রত্ন যেমন প্রশ্ন করেছিলেন, “এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা অবলম্বন করা ভাল, কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারাদি প্রবর্ত্তিত ভাষা গ্রহণ করা ভাল?”৩ বলাই বাহুল্য, রামনারায়ণ রত্নাবলীর অনুবাদে অ

ারবি ফার্সি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেননি, (চতুর্থ অঙ্কের প্রথম প্রকরণে যদিও দ্বারপালের মুখে হিন্দি সংলাপ ঢুকিয়েছেন) কিন্তু তাঁর সংলাপের ধাঁচ কিছুটা ওইদিকেই।

মূল পাঠকে ব্যবহার করা এবং সংলাপের ভাষা বিষয়ে মধুসূদনের মনোভাব রামনারায়নের ঠিক বিপরীত মুখে। পুরাণ বা ইতিহাস যাকেই অবলম্বন কন না কেন, মধুসূদন তার মধ্যে তাঁর চারপাশে পরিব্যাপ্ত সময়কে ধ্বনিত করে তুলবেনই। তঁার নাটকগুলির মধ্যে সেই প্রবণতাই আবিষ্কার করতে করতে যাব আমরা, সেই সঙ্গে আরো বোঝা যাবে বিশেষত প্রাচীন বিষয় নিয়ে লেখা নাটকে সংলাপের চল বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এ তো মনেই হয় যে মধুসূদনের মেজাজ খানিকটা ধ্রুপদী, তাই নাটক দুটি লিখে তিনি সময় নষ্ট করছেন বলে মনে করেন, অথবা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন অসংস্কৃত ভাষায় লেখা কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া।

চির এই বৈপরীত্যের জন্যই, রামনারায়ণ যখন শর্মিষ্ঠা নাটকটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তার ওপর কলম চালান তাতে মধুসূদন প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। মেয়েদের সংলাপকে নাকিCold prose এ পরিণত করা হয়েছে, ব্যাকরণগত অশুদ্ধি ঠিক করার নামে পালটে দেওয়া হয়েছে ভাষাভঙ্গি। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন তিনটি গুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যা নিশ্চিতভাবেই তাঁর নাট্যবোধকে প্রকাশ করে। 1.You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor-self," 2. but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? আর 3. it is my intention to throw off the fetters, forged for us by a servile admiration for everything Sanskrit. মধুসূদনের লেখায় কলম চালাতে গিয়ে কী করেছিলেন জানিনা, কিন্তু রামনারায়ণের সংলাপকে খুব নিস্প্রাণ গদ্য বোধহয় বলা যাবে না । বরং মনে হতে পারে, অভিনেয়তার কথা মনে রেখে একটু তরল গদ্যই লেখেন তিনি, নাটকের ধ্রুপদী গাম্ভীর্য বজায় রাখার দায় না মেনেই। এই জায়গায় তাঁর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু অনুমান নির্ভর সে আলোচনায় না গিয়ে, আমরা বরং ভাবার চেষ্টা করি, অনুবাদের ভাষা বাদ দিয়েও রত্নাবলীতে কি এমন কিছু ছিল যাকে তাচ্ছিল্যযোগ্য মনে করেছেন মধুসূদন ? শর্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায় সেই বিখ্যাত গানটি কি রত্নাবলী বিষয়ে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করে ?

এ গানে ভারতভূমিকে নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠতে বলা হচ্ছে, কেননা হইল, হইল ভোর দিনকর প্রাচীতে উদয়। সেই সঙ্গে বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস এবং ভবভূতির জন্য আক্ষেপ করা হচ্ছে। দিনকর প্রাচীতে উদয় বলতে কী বোঝায় তা আমরা জানি। রেনেসাঁস পরবর্তী য়ুরোপ বাহিত চিন্তা চেতনার সঙ্গে তাহলে তিনি মেলাচ্ছেন ভরতীয় সাহিত্যর ধ্রুপদী সম্ভারকে। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্য ব্যাপক ভাবে এই সমন্বয় করতে চেয়েছে। এই সময়ে সাহিত্যের একটা বড় অংশ বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় পুরাণ বা ইতিহাসকে, তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন পশ্চিম থেকে পাওয়া সাহিত্যাদর্শ দিয়ে। কিন্তু দেশজ বিষয়ের ততখানিই তো গ্রহণ করা হবে যাকে উনিশ শতকের নবোদিত চিন্তায় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলা যায়। সেক্ষেত্রে বাল্মীকি আর ব্যাসের কথা বলাই বাহুল্য, এই দুটি খনিগর্ভ থেকে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য অজস্র ঋণ গ্রহণ করেছে, মধূসূদন নিজেও সে গ্রহীতাদের অন্যতম। এদের দুজনকে বাদ দিলে, দেখা যাচ্ছে মধুসূদন উল্লেখ করেছেন শুধু কালিদাস ও ভবভূতির নাম। এ নিতান্ত ছন্দ মেলানোর প্রয়োজনে বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। বস্তুত, য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী করে এই দুই কবিকেই রাখা হয়েছে উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে--- য়ুরোপীয় সাহিত্যর শ্রেষ্ঠ কবি শেক্সপীয়রের সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করে লিখেছেন বঙ্কিম হরপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথেরা, ভবভূতিকে নিয়েও ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয়েছে মধুসূদনের ক্ষেত্রে দেখছি, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তাঁর লেখায়, শর্মিষ্ঠা নাটক সম্পর্কেই এ কথা বলা যেতে পারে। শকুন্তলার মতই এ নাটকের প্রধানা নারী চরিত্রটি তার সরলা অবলা ভাবমূর্তি ছেড়েবেরিয়ে আসছে মানুষের পরিচয়ে। উত্তররামচরিতেও আছে অন্যায় সিদ্ধান্ত নেবার পর রামের তীব্র বেদনা, নারী আর পুষের সম্পর্কে সেখানে সত্য ভালবাসার আঁচ এসে লাগে। সে আঁচ রত্ন

াবলীতে নেই। সেখানে আছেন এক খেলুড়ে রাজা, স্ত্রীর দাসীকে দেখে যিনি তার প্রেমে পড়েন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের ছকে স্ত্রীকে লুকিয়ে প্রেম নিবেদনচলে সেখানে, এইসব লুকোচুরি কখনো স্ত্রীর কাছে ধরাও পড়ে যায়, কিন্তু তাই নিয়ে এমন কোন হৃদয়মন মথিত ককরা সংকট তৈরি হয় না, যাতে সপ্তম শতকের এক সামন্ত রাজার ভেতর থেকে চিরকালের মানুষ বেরিয়ে আসে।

লক্ষ করবেন, শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনীবৃত্তও কিন্তু একই। সেখানেও দাসীর ছদ্মবেশধারিণী রাজকন্যার প্রতি রাজার প্রেম, রানীর আপত্তি, বাধাদান, আর শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া। তার পর শর্মিষ্ঠায় ‘foreign air’ ?এর ঘোষণা সত্ত্বেও সংস্কৃত নাট্যরীতির ব্যাপক দুর্বল ব্যবহার চোখে পড়বেই। প্রথম নাটক লেখার আড়ষ্টতা বলে একে এড়িয়ে গেলে চলবে না, কারণ বহুদিন আগে, মাদ্রাজে থাকার সময় লেখা ইংরেজি নাটক ‘Rizia : The empress of Ind’গঠনের দিক থেকে ছিল অনেক সক্ষম রচনা।

নিজের নাটকের প্রযোজনা বিষয়ে মধুসূদন যে সব সময়েই খুব আগ্রহী ছিলেন তা তাঁর চিঠিপত্র থেকেই বুঝতে পারা যায়। প্রথম নাটকের বেলা সে আগ্রহ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। এও স্বাভাবিক যে মাদ্রাজ ত্যাগ করে কলকাতায় এসে তিনি যুক্ত হতে চাইছেন এখানকার তন্নিষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প প্রচেষ্টার সঙ্গে। বিশেষত, বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের ঐতিহাসিক তাৎপর্য মধুসূদনের না বোঝাবার কথা নয়, শর্মিষ্ঠার ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,“Sermista is to be acted at the elegant private theatre attached to the Belgachia Villa of the Rajas of Paikpara. Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen the earliest friends of our rising national theatre.”৮ এই অবিস্মরণীয়তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেবার তাগিদেই কি তিনি বেছে নিলেন এমন এক আখ্যান, যে আখ্যানের ধরন রাজারা ইতোপূর্বে পছন্দকরেছেন? সেই একই কারণে মেশাতে হলো রাজাদের অভ্যাসানুসারী কিছু উপাদান, আর নাটকের ওপরের স্তরে এই আপোষটুকু করে গভীরতার স্তরে তিনি বুনে দিতে চাইলেন রত্নাবলীর তুলনায় গহনতর এক মানবিক সংকটের কাহিনী। এই সূত্রে দুটি কথা মনে রাখা ভাল। এক, শর্মিষ্ঠায় বিধৃত রত্নাবলী প্রতিম দুই নারী এক পুরষের ছক তিনিআর ফিরিয়ে আনবেন না কখনো, তার বদলে ব্যবহার করবেন দুই পুষ এক নারীর ছক, আর দুই, পরবর্তীকালেকৃষ্ণকুমারী নাটকটি কিন্তু বেলগাছিয়ায় অভিনীত হয়নি যে নাটকে তাঁর নিজস্বতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

নানারকম আপোষের কারণেই হয়তো, শর্মিষ্ঠা নাটক হিসেবে খুব ভাল কিছু হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রত্নাবলীরতুলনায় তার মধ্যে মানবিক গভীরতা তৈরির চেষ্টা অনেক বেশি। নিছক সংলাপ সাজানোর উদাহরণ থেকেই তা হয়তো ধরতে পারা যাবে। রত্নাবলী এবং শর্মিষ্ঠায় দুই রাজার বিরহবর্ণনায় অংশ আমর পাশাপাশি রেখে দেখতে পারি

রত্নাবলী সেদিন সারিকার সেই সকল কথা শুন্‌লেম্ চিত্রপট দেখলেম, প্রিয়া সাগরিকাকেও পেলেম, আহা! এই সকল ব্যাপারে সেদিন কি আমোদেই ছিলেম তা বলা যায় না। আমোদে সে দিনটা যে কোথা দে গেল তা জান্‌তেও পারলেম না। কিন্তু আজকেকার বেলা কাটান যে বার হলো।	শর্মিষ্ঠা আহা! কি কুলগ্নেই যে দৈত্য দেশে পদার্পণ করেছিলেম। (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি একথা বলা উচিত ? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নগুলি ব্যথিত হয়, কেননা দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের সার পদার্থ দর্শন করেছে (পরিভ্রমণ) বাড়বানলে পরিতৃপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠি হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম ?

মধুসূদনের সংলাপে অলঙ্করণের বাহুল্য, রত্নাবলীকে পাশে রাখলে খুব অভিনয়যোগ্যও হয়তো তাকে বলা যাবে না,কিন্তু নাটকীয়তার উপাদনগুলি শর্মিষ্ঠায় অনেক বেশি যোগ্যতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। সংলাপের মধ্যে যখন মঞ্চনির্দেশ

দেন মধুসূদন, তখন বোঝা যায়, অংশটিকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। পাঠক লক্ষ করবেন, রত্নাবলীর স্বগতোক্তিটি একমুখী, শর্মিষ্ঠায় নানা পরস্পর বিপরীত ভাবের টানাপোড়েন আছে, নিছক বিবৃতি নয়, শর্মিষ্ঠায় সংলাপ চরিত্রটির অন্তর্বুনোটকে প্রকাশ করে। সর্বোপরি, রামনারায়ণের সংলাপ তরল, আমোদ, বেলা কাটান ভার হল, ধরনের সংলাপ প্রেমের ব্যাকুলতাকে গভীরতাহীন করে তোলে, মধুসূদনের সংলাপ তার সংস্কৃতানুসারী ভাবালুতা সত্ত্বেও, সে দোষ থেকে মুক্ত।

আমার মতে, রত্নাবলী নাটকর দুর্বলতম অংশ একের পর এক আকস্মিকের ব্যবহার। যাদুবিদ্যার প্রয়োগ, গায়িকার ভূমিকা প্রভৃতি কৌশল নাটকের পরিণতিকে আকস্মিকতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করে, যার সঙ্গে নাট্যকাহিনীর অনিবার্য, জৈব কোন সম্পর্ক নেই। মধুসূদন এই দুর্বলতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছেন। তার কারণও নিশ্চয় রামনারায়ণের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিরই তফাৎ। মূল রত্নাবলী রচিত হচ্ছে রাজতন্ত্রের যুগে, সেখানে নাটককারের লক্ষ্যএক আনন্দময় উপসংহার, তার জন্যে নাটকের পরিণতিতে যাবার পথে মানবিক সম্পর্কগুলিকে নানা দোলাচলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ বা পরীক্ষা করতে চাইছেন তিনি।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। মধুসূদন তাঁর এই রত্নাবলীপ্রতিম কাহিনীবৃত্তটি গ্রহণ করেছেন পুরাণের চেনাগল্প থেকে। ভারতীয় এবং গ্রিক পুরাণের প্রতি যে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ ছিল তা আমরা সকলেই জানি, বিশেষ করে ভারতীয় পুরাণ তাঁর লেখায় কি মহাসমারোহে এসেছে তাও নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে দিতে হবে না। চেনা গল্প, চেনা চরিত্র, ছোটবেলা থেকে যা শুনে শুনে বড় হয়ে উঠেছি, তাকেই যখন নাটকে বা কাব্যে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝা যায় লেখক আসলে চেনা কাহিনীটির উপরিস্তর অবলম্বন করে তার সমকাল সম্পৃক্ত তাৎপর্যে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছেন। ফলে, সেখানে কাহিনীটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক প্রতীক, যেখানে --- “the particular represents the general, not as a dream, not as a shadow, but as a living and momentary revelation of the inscrutable.”
পুরাণকে সমকালীন তাৎপর্যে ব্যবহার করার ব্যাপারে খুব সচেতন পটুত্বের উদাহরণ শর্মিষ্ঠায় বেশি পাওয়া যাবে এমন নয়। এই ছোট প্রবন্ধে একটি দুটি প্রসঙ্গই সামনে রাখতে চাই, যে দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো পরবর্তী নাটকগুলোয় আরো ব্যাপ্তি পাবে। ক. বকাসুরের সংলাপে আছে, দৈত্যরাজ শুক্রাচার্যের অভিশাপের ভয়ে ভীত হয়ে শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসী করাই সংগত, কেননা, “যদি কোন বণিক সুবর্ণ, রৌপ্য, ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত একখানি পোত লয়ে সমুদ্রে গমন করে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদায় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করে না ?” খ. মানুষ নিজেই তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী, শর্মিষ্ঠা বলেছে,, ‘আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি-- আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তার অন্যের দোষ কি ?’ গ. বিদুষকের সংলাপ -- “লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী প্রণয় কি সম্ভব?”

শর্মিষ্ঠায় ছিল মহাভারতীয় কাহিনীর ব্যবহার, আর পরের নাটক পদ্মাবতী শু হল গ্রিক পুরাণের কাহিনীর আদলে, পরের মধুসূদন তাকে স্বাধীনভাবে বয়ে যেতে দেবেন। উৎসের পাঠকে ভেঙে ফেলবার এই প্রবণতা তাঁর পরের নাটক কৃষ্ণকুমারীতে দেখব, যেখানে ইতিহাসের কংকালটুকুই রাখবেন তিনি, ভেতরের রক্তমাংস তৈরি করবেন নিজের ইচ্ছেমত। আর শেষ নাটক মায়াকাননে তো তৈরিকরা হচ্ছে একটা ছদ্ম প্রাচীন পটভূমি, পুরাণ বা ইতিহাসের পূর্বরচিত কাহিনীবৃত্তকে অস্বীকার করে।

বোঝা যায়, নিজস্বতার যে সাহসে ভর করে শর্মিষ্ঠার গল্পে সন্তর্পণে সঞ্চার করে দিতে চেয়েছিলেন আধুনিক তাৎপর্য, তা বেড়ে উঠছে ক্রমশ, পুরাণ বা ইতিহাসের মূল পাঠকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হয়তো এরই প্রকাশ ঘটবে পদ্মাবতীর সমকালে লেখা ব্যঙ্গ নাটক দুটিতে, যেখান থেকে মধুসূদন আবার ফিরে এসেছিলেন ধ্রুপদীপটভূমিতে। সে বিষয়ে ভাবার অবকাশ এ প্রবন্ধে হবে না, আমরা বরং লক্ষ করি, কোন পুরাণে ইতিহাসে বা কল্পনায় প্রাচীন পরিবেশ নির্মাণ করতেই স্বস্তি

বা আগ্রহ বোধ করেন মধুসূদন।

একটি দুটি কারণ সহজেই বোঝা যায়। প্রথমত, মধুসূদনের মেজাজেই ছিল এক ধ্রুপদী প্রবণতা, শুধু নাটকে নয়, তাঁর কবিতার বিষয় নির্বাচন থেকেও তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। দেশী বিদেশী ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠের ফলে এই প্রবণতা। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনের ইতিহাস যদি মনে রাখি তবে দেখা যাবে সর্বদা প্রবল আবেগে দোলায়িত যে কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জীবনকে অনায়াসে বাজি রাখা এই চিরতণ কবিকে কোন গৃহস্থপনার বাঁধাযাবে না। হয়তো তাই তিনি অ াত্মীয়তা বোধ করেছেন পুরাণ মহাকাব্যের সেই সব জীবনের চেয়ে বড় চরিত্রদের সঙ্গে। উতরোল সেই সময়, এবং উতরে াল তাঁর ব্যক্তিজীবনে সমকালীন কোন আধার আয়ত্তই করতে পারত না।

এছাড়া, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও এক ধরনের দায়িত্ব বোধ করেছেন তিনি। দুটি দুরন্ত ব্যঙ্গ নাটক লেখার পর তাঁর মনে হয়েছে, “You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have farces…”
এর বাইরে আরো একটি কারণের কথা মনে হয়। পুরাণ বা ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে মধুসূদন কি সরে যেতে চাইছিলেন সম্ভাব্যতার নানা গর্ত দিয়ে ঘেরা বাস্তবতার থেকে ? পদ্মাবতী আর মায়াকাননে দেখছি বাস্তব অতিরিত্ত এক ফ্যান্টাসি বা অলীককে প্রয়োগ করা হচ্ছে পার্থিব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, যার ফলে অলীক আর বাস্তবের টানাপোড়েনে বাস্তবের একটা ভিন্ন মাত্রা তৈরি হতে পারে। একটু স্বাধীনতা নিয়ে কি ভাবা যায়, কৃষ্ণকুমারীতেও অন্তঃপুরচারিণী অপাপবিদ্ধা মেয়েটির মনে মানসিংহ বিষয়ে এক ফ্যান্টাসিই বুনে দেয় মদনিকা, যেন রূপকথার রাজপুত্র,চেনা জগতের বাইরে থেকে অন্য এক সুরে যে জীবনকে ভরিয়ে দিতে চায়।

শর্মিষ্ঠায় বিছিন্নভাবে ছিল লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের কথা, আর পরের নাটক পদ্মাবতীতেই দেখব, নারদের প্ররোচনায় শচী রতি আর মুরজার মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে, এই তিনজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী তা বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে রাজা ইন্দ্রনীলকে। এই পর্যন্ত এ নাটক প্রখ্যাত গ্রিক কাহিনীটির অনুবর্তী, শুধু একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মূল গল্পে কলহপ্রিয়া দেবী ডিসকর্ডিয়া সোনার আতাটি ছুঁড়েছিলেন জুনো, প্যালাস ও ভেনাসের মধ্যে ঝগরা বাধিয়ে দেবার জন্য। জুন জুপিটারের পত্নী, যেমন ইন্দ্রের পত্নী সচি, ভেনাস ঋসৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক, রতিরই মত। কিন্তু ঋজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পালামকে মধুসূদন করেছেন কুবের পত্নী মুরজা। বলা বাহুল্য, ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসের কাছে প্রতিপত্তি এবং বিদ্যার তুলনায় প্রেমকে বরণ করেনেওয়া যত সহজ, মধূসুদনের নায়কের পক্ষ্যে অন্তত বিদ্যাকে খারিজ কর া তত সহজ ছিলনা, তাই অর্থ বা প্রতিপত্তির বদলে ইন্দ্রনীল বেছে নেয় প্রেমকে। রাজনারায়ণ দত্তের অমিত প্রতিভাশালী স্ব াধীনচেতা পুত্র, যিনি কোন ধর্মভাবুকতার কারণে নয়, স্রেফ নিজের স্বাধীন ইচ্ছার অনুগত থাকতে ত্যাগ করেছিলেন বাবার বিপুল সম্পত্তি ওবহু প্রতিপত্তিময় বংশকৌলীন্যের উত্তরাধিকার, মাদ্রাজে সামান্য মাইনের চাকরি করেছেন, কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় ফিরে কাজ করেছেন পুলিশ কোর্টে, তঁর নায়ক ইন্দ্রনীল বেছে নিল প্রেমের দেবী রতিকে। এমন নয় যে অর্থ প্রতিপত্তি আর স্বাধীন দারিদ্র্যের মধ্যে তৃতীয়টিকে খুব অনুশোচনাহীন মনে নির্বাচন করেছেন তিনি। নিজের আর্থিক অবস্থানিয়ে বেশ ক্ষোভ ছিল তাঁর মনে, চেষ্টা ছিল পিতৃসম্পত্তির উদ্ধারের। ১৮৬২ সালে বিলেত যাবার সময় পদ্মাবতীর লেখক প্রগাঢ় অভিমানে লিখবেন, But I suppose, my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the muse.”
সিদ্ধান্তেই মানুষের সবটুকু পরিচয় নয়, সিদ্ধান্ত নেবার আগে - পরে জেগে ওঠা নানা দোলাচল নিয়েই তার সম্পূর্ণতা। সে সম্পূর্ণতার প্রতিফলন ঘটে সৃজনের মধ্যে, তাই ইন্দ্রনীলের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মধুসূদনেরই জীবনেতিহাস ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে ধরা পড়ে নবজাগ্রত উনিশ শতকের একটি মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে--- তার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে মানুষই সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ, ব্যক্তিগত পছন্দের জন্যে সে সব কিছুকেই ত্যাগ করতে পারে। শচী রতি মুরজার ফ্যান্টাসি তাই ফেলে রাখা তিনটে রাস্তা, আধুনিক মানুষ এর মধ্যে কোনটাকে বেছে নেবে?

ব্যক্তির এই নির্বাচনক্ষমতায় সমাজের সঙ্গে তার একটা বিরোধ তৈরি হচ্ছে। সমাজ ব্যষ্টির কথা ভেবে কিছু নিয়ম নীতি প্রথা বা মূল্যবোধ তৈরি করে, সাধারণের থেকে আলাদা কোন ব্যক্তি তাকে না মানতেও পারেন। সমাজ সাধারণত প্রয়োজনীয় মনে করে তাকেই, যা স্পর্শগ্রাহ্য, পার্থিব। স্বভাবে স্বতন্ত্র মানুষ যখন তাঁর নিজস্ব চি পছন্দের জোর খাটাতে চান, তখন তিনিdestroys the very idea of obedience and duty, there by destroying both power and law." শচী এবং মুরজার সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিরোধের এই গল্পে বস্তুত সমাজ স্বীকৃত রীতি আর ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বৈপরীত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

পদ্মাবতীই মধুসূদনের শেষ মিলনান্ত নাটক। তবে একথা মনে রাখা চাই, নাটকটির পরিণতি অনেকটাইআকস্মিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুরজা যে ভাবে জানতে পারেন পদ্মাবতীর সত্য পরিচয়, তা নাট্যকাহিনীর পক্ষে অমোঘ হয়ে আসে না। প্রায় যে রত্নাবলীর মতই জোর করে সুখী সমাপন ঘটানো হলো এখানে। কাহিনীবৃত্তে অলীকেরএকটি গুত্বপূর্ণ ব্যবহার থাকায় এ আক স্মিকতা তেমন ধাক্কা হয়তো তৈরি করে না, হয়তো কমেডির স্বাদু আমেজই আনে, তবু মনে প্র জাগে, এই পরিণতি দেওয়ায় ইচ্ছাপূরণ যতটা রইল, জীবনের সত্য ততটা ধরা দিলনা?

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জীবনকে গভীর তল পর্যন্ত খুঁড়ে দেখতে চান যিনি, তাঁর পক্ষে তাই হয়তো সম্ভবহল না আর নিটোলতায় ফিরে আসা! ১৮৬০ সালে প্রকাশিত পদ্মাবতীতে প্রেমের দেবী রতি ভগবতী গিরিজার সাহায্যে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ করে দিলেন ইন্দ্রনীলকে, আর এর ঠিক উল্টো পথে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যে দেবতাদেরই সাহায্যে অন্যায় যুদ্ধে হত হলেন প্রেমিক আর বীর ইন্দ্রজিৎ। সুধু তাই নয়, পদ্মাবতী লিখতে লিখতে হাত দিচ্ছেন দুটি সমকালনির্ভর নাটক রচনায়, অস্নিগ্ধ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ভরা, আর ১৮৬১ তেই প্রকাশিত হবে কৃষ্ণকুমারী নাটক। সেখানে দেখি, নিজের মতন করে একটি ভুবন গড়তে চেয়েছিল রাজকুমারী কৃষ্ণা, তাকে মরতে হল শেষ পযন্তে। সে মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন না কোন দেব দেবী, বরং পদ্মিনীর প্রেত অথবা চারজন সন্ন্যাসী তার মৃত্যুকেই নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ব্যক্তিগত হতাশা, যা মধুসূদনকে ১৮৬২ সালে কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে প্ররোচিত করবে, শুধু তারই প্রভাব পড়েছে পদ্মাবতী পরবর্তী নাটক দুটিতে, একথা ভাবা ঠিক হবে না। নির্বিচার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিপদও হয়তো তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছার সঙ্গে সমাজের প্রতি তার দায় নিয়ে টানাপোড়েনও হয়তো প্রকাশি পাচ্ছিল এই সময়ে লেখা নাটকে।

পদ্মাবতীতে ইন্দ্রনীল শুধুই একজন ব্যক্তি, তাঁর রাজপরিচয় বাইরের আবরণ মাত্র, নাটকে তাতে কোন অনি বার্যতা আনে না। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী আর মায়াকাননে এই সামাজিক পরিচয় খুব বড় ভূমিকা নিয়ে এল। সেখানে রাজা মানে বহু মানুষের প্রভু, রাজ্যের, প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের দায় তাঁর ওপর। সেই দায় মেনে নিয়ে ব্যক্তি ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে ভীমসিংহ আর অজয়কে।

মনে পড়ে স্বয়ং মধুসূদনকে। নিজের ইচ্ছায় ধন পরিত্যাগ করেছেন তিনি, কোন স্পষ্ট ঘোষিত কারণ ছাড়াই পরিত্যাগ করেছেন প্রথমা স্ত্রীকে--- আবার সংসার প্রতিপালনের জন্যে তাঁকেই নিতে হয় সামান্য এমন কি তাঁর যোগ্যতার পক্ষে অবমাননাকর সব কাজ, ধারা করতে হয়, তিরস্কৃত হতে হয় শোধ করতে না পেরে, এমন কি বিমূঢ় হতে হয় জেনে যাবার সম্ভাবনায়।

কিন্তু শুধু মধুসূদনই বা কেন, আমাদের নবজাগরণের একটা আবছা ছায়াও কি এই কাহিনী বিন্যাসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তিনি তো দেখেছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলের সেইসব অবিশ্বাসী প্রমুখর তণ তুর্কীরা ডিরোজিওর সঙ্গী ভাবশিষ্য সবাই, ত্রমে কেমন

পোষ মেনে গেলেন সমাজের কাছে। এমন কি কেউ কেউ শুদ্ধ জ্ঞানের আলোক প্রত্যহার করে ফিরে এলেন প্রবৃত্তির অধীনে। বস্তুত একমাত্র রাধানাথ শিকদারকে বাদ দিলে ডিরোজিও অনুগামীদের সকলেই তাঁদের যৌবনের আদর্শ থেকে কম বেশি ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। এর মধ্য থেকে এই দর্শন বেরিয়ে আসতে পারে যে ব্যক্তি-ইচ্ছার সঙ্গে যদি সমষ্টি ইচ্ছা কে না মেলানো যায়, তবে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় সমষ্টি নিরপেক্ষ ভাবে নিজেকে পূর্ণ করা। একথা মধুসূদনের মনে হয়েছিল কিনা জানি না, তবে আধুনিক কোন পাঠক বা নির্দেশকের পক্ষে এ দুটি নাটকের এমন তাৎপর্য আবিষ্কার করা খুব অসংগত না - ও হতে পারে।

এই পথেই মধুসূদনের নাটকে চলে এল একটি নতুন উপাদান-- যুদ্ধ। পদ্মাবতী নাটকে শচী আর মুরজার নির্দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় কলি, যুদ্ধবাধানোর পদ্ধতিটা আমাদের মনে রাখা দরকার---

মাহ্বেরী পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন---
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী,
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আয়িাছে নিজালয়ে, এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়েছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর দ্বারে।

পদ্মাবতীকে একটু বিপাকে ফেলার জন্যই এ যুদ্ধের আয়োজন, যার থেকে রতি অবিলম্বে তাকে উদ্ধার করবেন। অর্থাৎ যুদ্ধ বা যুদ্ধের উদ্যোগ কোন ব্যাপক ও গভীর সংকট তৈরি করছে না এখানে। কৃষ্ণকুমারী থেকে কিন্তু যুদ্ধের ভূমিকা বদলে য াবে, হয়ে দাঁড়াবে নাট্য পরিণতির নিয়ন্তা শক্তি। আপাতত আমরা লক্ষ করি, প্রেমিক প্রেমিকাকে গ্রহণ করেছে বলে অন্য র াজাদের ঈর্ষার এই ছকটিকেই পরের দুটি নাটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবেন মধুসূদন।

তাহলে কৃষ্ণকুমারী আর মায়াকাননে ঘটনার ধাপগুলি এইরকম পুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা কোন নারী একজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করে নিতে চায়, প্রেমহীন অন্য কেউ দখল করতে চায় সেই স্ব ইচ্ছাপরায়ণাকে, না পেলে ভয় দেখায় যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার। আমাদের মনে পড়বে ১৮৪৯ - ৫০ সালে মাদ্রাজের যুরো পিয়ান পত্রিকায় ধারাবাহিভাবে প্রকাশি ‘Rizia : Empress of Ind.’ নামে নাটকখণ্ডটির কথা। সেখানেও রিজিয়া, এক নারী, তার সামাজিক অধিকারের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে প্রেমিকরূপে বেছে নেয় ত্রীতদাস জামালুদ্দিন আইবককে, অ ার তাই তার হিন্দের শাসনকর্তা আলতুনিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করছে তার বিদ্ধে, জামালুদ্দিনকে হত্যা করছে, দুর্গবন্দী করে র াখছে রিজিয়াকে। প্রসঙ্গত, রিজিয়াকে নিয়ে বাংলায় একটি নাটক লেখার পরিকল্পনা ছিল মধুসূদনের, কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করলেন না।

নারীকে কেন্দ্র করে পুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমন কি যুদ্ধের এই ছকটি সাহিত্যে বহু প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, গ্রিক এবং ভারতীয় পুরাণকাহিনীতেই তার নির্দশন আছে। এর প্রভাব মধুসূদনের ওপর পড়তেই পারে, সমকালীন অন্য ন াটককারদের তুলনায় অনেক বেশি পুরাণ সচেতন হওয়ার কারণেই। আমরা দেখেছি, প্রেমকে ব্যক্তি - ইচ্ছার সর্বোত্তম প্রক াশ বলে ভাবতে চাইছেন মধুসূদন, সেক্ষেত্রে যুদ্ধকে রাখতে হবে তার বিপরীত প্রান্তে। যা কিছু প্রাত্যাহিক, পার্থিব, তাকে অস্বীকার করে জেগে ওঠে প্রেম, স্বতন্ত্র মানুষের কোমল, নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ। আর যুদ্ধ দাবি করে আনুগত্য, তার সম্ বল শারীরিক শক্তি, মানবিক সংবেদনশীলতা নয়, সে জোর দেয় মানুষের ধবংসকারী প্রবৃত্তির ওপর। মানুষের সভ্যতা যে সব জান্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করতে শিখেছে, যুদ্ধ তাকেই বরণ করে, আসলে সভ্যতাকেই অস্বীকার করে। কৃষ্ণকুমারীতে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে হত্যা করতে হয় যুদ্ধের হাত থেকেবাঁচতে, অনেক মানুষের শুভাশুভের দায় মাথায় নিয়ে। সেই একই কারণে অজয়কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, ইন্দুমতীকেসে তুলে দেবে ধুমকেতুর হাতে। দুই নারীই আত্মহত্যা করে, এই অ াত্মহত্যাই তাদের প্রতিবাদ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে হয়। মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানা অধিপত্য এবং অন্য শ্রেণীর ওপর প্রভুত্বের ইচ্ছা থেকেই যুদ্ধের সৃষ্টি।১৪ এই নাটকগুলি রচনার সমকালে মধুসূদন দেখছেন নীলচাষীদের অভ্যুত্থান এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভূমিকা। ঝুঁকি নিয়ে নীলদর্পণের অনুবাদ করছেন তিনি, হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যাবার পর। হরিশ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বুঝতে পারা যাবে রাজনারায়ণকে লেখ া এই চিঠি থেকে "of All men now living, he has exercised the greatest amount of influence over the educated classes of our countrymen, I hope he will recover. His death would be a real loss, not to our literature, for he writes Feringishly, but to the progress of Impendence of mind and thought." মনে রাখতে হবে, যে মানুষটির প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা মধুসূদনের ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিদ্ধে আবেদন পত্রটি সেই হরিশচন্দ্রের লেখা, ডালহৌসির দেশীয় রাজ্যগ্রাসের বিদ্ধে একত্র তিনিই অগ্নি উদ্‌গীরণ করেন, সিপাই বিদ্রোহে তিনি বিদ্রোহীদের সমর্থক।

১৮৫৭ সালে, সিপাই বিদ্রোহের আগের কয়েকবছর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদীদের নীতি স্পষ্ট হয়ে আসছিল। রাজা ও নবাবদের শাসিত অঞ্চলগুলো দখল করে ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, তাঁদের ও ব্রিটিশদেরমধ্যে যে সব চুক্তি হয়েছিল তাদের বাতিল করে দেওয়া, পুরনো ভূস্বামীদের জায়গায় নতুন বশংবদদের সুযোগ দেওয়া, রাজস্ব বাকি, কুশাসন ইত্যাদি ছলছুতোয় ভূসম্পত্তি সরাসরি কেড়ে নেওয়া, দেশীয় রাজাদের ইচ্ছেমত উত্তরাধিকারী নির্বাচনের অধিকার বাতিল করা প্রভৃতি। এর ফলে ভারতের রাজন্যবর্গ সরাসরি বিদ্রোহে যোগ দিলেন। শুধুযে নিষ্ঠুরভাবে সে বিদ্রে াহ দমন করা হলো তাই নয়, বিদ্রোহে সাহায্যকারীদের বিদ্ধেও স্পষ্টত প্রতিশোধনেওয়া হতে লাগল। ঝাঁসির রানী এবং অন্য অনেকের মৃত্যু হলো, বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হলো, বিদ্রোহীদের অনেককেই দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড।

এই ইতিহাস চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন মধুসূদন, হয়তো পড়েছেন আর্নেস্ট জোন্স এর মত কারো কারো লেখা, যাঁর া সরাসরি বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছেন। শুধু যে মেঘনাবধ কাব্যের মধ্যেই এই পররাজ্য গ্রাসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হচ্ছে তাই নয়, শেষ দুটি নাটকেও মধুসূদন একই কথা বলেছেন। বরং বলা যায় রাবণ যেহেতু পরস্ত্রী অপহরণকারী, তাই তার বিদ্ধে রামের পক্ষে যুক্তি দেওয়া সম্ভব, দেওয়া হয়েও ছে, আলোচ্য নাটক দুটি কিন্তু সে দ্বিধা থেকে মুক্ত।

যুদ্ধগুলির কেন্দ্রে আছে আছে একজন করে নারী, পুষশাসিত এই সমাজ তাদের দেখতে চাইছে পার্থিব সম্পত্তি হিসেবে, অগ্রাহ্য করতে চাইছে মেয়েটির নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের অধিকারকে। সম্পত্তি দখল নিয়ে এই লড়াইয়ের কাহিনী লেখা হচ্ছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, যখন অমোঘগতিতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ এ দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষত ১৮৫৮ সালের পর থেকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন বৈদেশিক বাণিজ্য ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে, এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধবংস হতে থাকে দেশীয় ছোট শিল্পগুলি। একি নিতান্তই আকস্মিক যে শুক্রাচার্যের কোপ থেকে বাঁচাবার জন্যে কেন শর্মিষ্ঠাকে বলি দিতে হবে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে বণিক আর তার পণ্যের উপমাই আসে? শচী রতি মুরজার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বাজার দখলের লড়াই দেখাটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ?কৃষ্ণকুমারীতে ধনদাসের মধ্যে নবোদিত বুর্জোয়া শ্রেণীর ছায়া দেখেন উৎপল দত্ত,১৬ সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে না হোক, জীবন দর্শনের দিক থেকে কি. এ মত উড়িয়ে দেওয়া যায়, যখন সে বলে আরে এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গ াইতে হয়, কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয়, আর কাকা মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয়। কিংবা একটু পরেই, পরক াল - পরকাল কি? তখন মনে পড়ে কমুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো, আত্মসর্বস্ব হিসাব নিকাশের ঠাণ্ডা জলে এরা (বুর্জোয়ারা) ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম- উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ কূপমণ্ডুক ভাবালুতা।

শর্মিষ্ঠায় দেখেছি এক বণিকের কর্তব্যবুদ্ধির উদাহরণ, আর শেষ নাটক মায়াকাননে ইন্দুমতীর একটি তীক্ষ্ণ সংলাপে নানা

নাটকে ছড়ানো বিচ্ছিন্ন উদাহরণগুলি এক সংযোগসূত্রে বাঁধা পড়ে যাবে। যখন ঠিক হয়ে গেছে ইন্দুমতীর ভবিতব্য, তাকে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধুমকেতু সিংহের কাছেই যেতে হবে, আর সে নিজে যখনি ঠিক করে নিয়েছে তার পরিণতি, তখন হঠাৎ সখীকে বলা তার এই সংলাপটি বিদ্যুৎচমকের মত জ্বলে ওঠে--- আমার পিতা শুভক্ষণে বণিক বেশ ধারণ করেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কন্যা, সেটিও আজ বিনিময় হতে যাচ্ছে। মায়াকানন পাঠান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ে এই ভেবে, এমন একটি গভীর নাটক শেষ করে যেতে পারলেন না মধুসূদন, তার রচনা শেষ করলেন কোন্ এক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমন কুৎসিত সমাপ্তি মধুসূদনের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতে পারত বলে বিশ্বাস হয় না।

তাঁর নিজেরই অপছন্দের দুটি ব্যঙ্গ নাটকের কথা বাদ দিলে, রামনারায়ণ বা দীনবন্ধুর মত সমকালনির্ভর নাটককার ছিলেন না মধুসূদন। কিন্তু এও সত্যি যে, পুরাকাহিনীর বিন্যাসেও অপ্রত্যক্ষে কড়া নাড়ে তাঁর সমকাল, ব্যক্তিগত এবং সামূহিক জীবন সংকট, হয়তো আরো প্রবল অভিঘাতে।

১. বিজ্ঞাপন, রত্নাবলী, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, ড. সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৩৮৭

২. কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাস, জানুয়ারি ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১২৯।

৩. প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি, রামগতি ন্যায়রত্ন, বাংলা প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খণ্ড, সম্পা. নীলরতন সেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৭৫।

৪. ড. সুকুমার সেন অনুমান করেছেন , উদ্দিষ্ট পুস্তকটি হলো হুতোম প্যাঁচার নকশা। দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ইস্টার্ণ পাবলিশাস্য, ১৩৮৬, পৃষ্ঠা ১৬৩।

৫. গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠি, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ,মে ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৪০ - ৪১।

৬. ড. অজিতকুমার ঘোষ মনে করেছেন, শর্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায় মধুসূদন যে মন্তব্য করেছিলেন তা তাঁর বহু একপেশে অহমিকাপূর্ণ উক্তির আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আসলে পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যদর্শ গ্রহণ করতে পারেননি। সেই জন্য সংস্কৃত ন্যটারীতি অনুসরণে লিখিত নাটকের গুণাগুণ বিচার না করে তিনি তার প্রতি অবিমিশ্র অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ভূমিকা, মধুসূদন রচনাবলী, হরফ, আগস্ট ১৯৯৭, পৃষ্ঠা আঠার। আমি এই মত মান্য বলে মনে করি না, সংস্কৃত নাটক এবং নাট্যাদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের প্রমাণ এইপ্রস্তাবনাতেই আছে।

৭. “The characters are true to types, without originality. …The poetry of Harsa has neither the graceful freshness nor the rich imagination of Kaliidasa.” The Theatre of India, Sylvain levi, vol. I. Tr. Narayan Mukherjee, Writers Workshop, 1978

৮. Advertisement, Sermista, মধুসূদন রচনাবলী, হরফ, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৯. A Dictionary of Symbolism, J.E cirlot, Routledge & Kagan Paul, 1978, Page. xxix.

১০ রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি, তারিখ ২৪ এপ্রিল ১৮৬০, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা ৫৪৫।

১১. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি, ঐ, পৃষ্ঠা ৫৬৫।

১২. Individualism, Steven Lukes, Basil Blackwwell, 1973, page 6.

১৩. Besides, Baboo Jotindra Thinks, And the Raja Seems to Participate in the opinion, that Mohomedan names will not perhaps hear well in a bengalee Drama,”…
দ্র. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবণচরিত যোগীন্দ্রনাথ বসু, অশোক পুস্তকালয়, ১৯৭৮ পৃষ্ঠা ৩৪৩-৪৪।

১৪. Marx and Engels disproved the theory that war is eternal and inevitable and showed that wars came about because of the domination of Private ownership and the policy of the exploiting classes, A dictionary of Philosophy, Ed, M. Rosenthal & P. Yudin, Progress Publishers, Moscow, 1967, page 478.

১৫. মধুসূদন রচনাবলী, সাহিংত্য সংসদ, পৃষ্ঠা ৫৫৯.

১৬. “প্রগৃত বুর্জোয়ার অনৈতিক চরিত্র ধনদাসে পরিস্ফুট। মুনাফার জন্য দরিদ্রের মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তির পথের স্থাপন করতে নূতন বুর্জোয়া শ্রেণীর একটুও বাঁধে না,...”
আশার ছলনে ভুলি, উৎপল দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১২২।
১৭. কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার, মার্কস এঙ্গেলস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৩১।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা থেকে সংগ্রীহিত